International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 328-337
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.227

স্বাধীনতা আন্দোলনে নদিয়া: চেনা অধ্যায়ের অদেখা পাতা

প্রসেনজিৎ সিকদার
গবেষক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 20.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

After the Battle of Plassey, colonial rule was established in Bengal. Later, it was the British government that granted Nadia the status of a district. The brave sons of Mother India were committed to bringing back the glory of independence in exchange for their lives. Just as the sunset of independence took place in the verge of Nadia, the brave sons of Nadia sacrificed their lives for the sunrise of independence. Whether it was the Congress movement or the armed revolutionary movement, the revolutionaries of Nadia were at the forefront. Starting from the Blue Rebellion, the anti-British movements like Swadeshi, Non-Cooperation, Civil Disobedience, and Quit India Movements were supported by the patriots of this district, who formed the revolutionary public opinion in favour of them. They also made a significant contribution to the armed revolutionary movement. People from all walks of life, irrespective of caste, religion, and colour, joined this pro-independence movement. Even the women's power did not keep itself behind from this great anti-British liberation movement. This research paper highlights the neglected aspects of the freedom struggle of the patriots of Nadia district in the freedom movement.

Keywords: Bharat Sabha, freedom movement, Patriots, Virangana, Secret Society, Revolutionism

নদিয়া পশ্চিমবঙ্গের একটি অন্যতম প্রাচীন জ্ঞানগরিমা, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহ্যগত ভাবে সমৃদ্ধশালী জেলা। মধ্যযুগে বিদেশীদের লেখনীতে নদিয়ার নাম উল্লেখ থাকলেও একটি স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে নদিয়া মানচিত্রে স্থান পেয়েছিল ১৭৮৭ সালে।[১] নদিয়ার মানচিত্রায়ন বা সীমানা নির্ধারণের কাণ্ডারী ছিল সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসক। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের ফলে এই বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনা হয়েছিল। ফলস্বরূপ বণিকের মানদণ্ড সেদিন রাজদণ্ড রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল এই জেলাতে। ব্রিটিশ শক্তির ক্ষমতা করায়ত্ত দ্বারা সূচনা হয়েছিল সমগ্র ভারতের পরাধীনতার অশুভ যাত্রা। নদিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্য নদিয়ারাজ বংশের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে কেন্দ্র করে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল। আবার তাঁরই রাজত্বের শেষ দিকে এই গৌরব ইংরেজ রাজত্বের সূচনার ফলে ম্লান হতে শুরু করেছিল। ব্রিটিশ আধিপত্যের পূর্বে নদিয়ারাজ বংশের আয়তন ছিল বিশাল বিস্তৃত।

রাজ্যের উত্তর সীমা মুরসিদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথীখাদ।।

দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার।
পূর্ব্ব সীমা ধুল্যাপুর বড় গঙ্গা পার।।[২]

কিন্তু রাজশক্তি হস্তান্তরের ফলে ইংরেজরা তাদের দেশের অনুকূল আইন ব্যবস্থা চালু করলে জেলা হিসাবে নদিয়ার আয়তন অনেক ছোটো হয়ে যায়। আর স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় দেশভাগ জনিত কারণে এর আয়তন একেবারে সংকুচিত হয়ে পড়ে।

ভারতের স্বাধীনতার সূর্যাস্ত যেমন এই বাংলা থেকে হয়েছিল তেমনি তা ফিরিয়ে আনার জন্য সংগ্রাম এখানেই প্রথম শুরু হয়েছিল। বস্তুত: বাংলাদেশই সমগ্র ভারতের বিপ্লববাদের দ্রষ্টা স্রষ্টা ও পোষকের ভূমিকা পালন করেছিল।[৩] বাংলা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ত্রাস; যে কারণে তারা বাংলাকে ক্ষত-বিক্ষত করার জন্য বাংলার উপর নানা ভাবে করাঘাত করেছে। ব্রিটিশদের মনে এটি দৃঢ় ভাবে ঘর করেছিল যে, সম্মিলিত বাংলাদেশ একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি আর তাদের উদ্দেশ্য হল এই ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে দুর্বল করা।[৪] অবিভক্ত বাংলার মাটিতে মঙ্গল পাণ্ডের মতো ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে যুক্ত ভারতীয় সেনারা বিদ্রোহ করে আবার একই সঙ্গে দেশকে স্বাধীন করার জন্য বহু স্বদেশপ্রেমী বিদ্রোহ করেছিলেন। বলাবাহুল্য ভারতের স্বাধীনতার সূর্যাস্ত নদিয়া জেলাতেই হয়েছিল, কেননা পলাশির যুদ্ধ ক্ষেত্র এই জেলার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। এই জেলায় অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশমাতৃকাকে ব্রিটিশ পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার জন্য তাঁদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করার জন্য এতো আত্মত্যাগ এই জেলাকে স্বাধীনতার অগ্নিগর্ভ স্থানে পরিণত করেছিল। তাই বলা যায় যে, দেশকে পরাধীনতার শিকল থেকে মুক্ত করতে স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ছিল নদিয়া জেলা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল সমাজসংস্কার আন্দোলন ও জনশিক্ষা প্রসারের ফলে নদিয়া জেলায় বহু শিক্ষিত ব্যক্তি সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ হন। তাঁরা ভারতবর্ষের সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে ব্রিটিশের শোষণ ও শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য ভাবনাচিন্তা করতে থাকেন। এই ধরণের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা ও রাজনৈতিক আদর্শে নদিয়া জেলার যে সকল ব্যক্তিরা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হন, তাঁদের মধ্যে শ্রীরামতনু লাহিড়ী, শ্রীলালমোহন ঘোষ, শ্রীমনমোহন ঘোষ ও শ্রীতারাপদ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।[৫] কলিকাতার বুদ্ধিজীবী ও বিত্তশালীদের সংগঠন 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন', নবগোপাল মিত্রের 'হিন্দুমেলা', দুর্গামোহন দাস ও ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইণ্ডিয়ান লিগ' প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী সংগঠন গুলি কলিকাতাসহ সারা বাংলাদেশের জাতীয়চেতনার উন্মেষ ঘটায়। বলাবাহুল্য, এই সমস্ত জাতীয়তাবাদী সংগঠন গুলির সাথে নদিয়া জেলার জাতীয়তাবাদী নেতাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।[৬] এই সকল সংগঠনের প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে কার্য পরিচালনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যুক্ত ছিলেন এই জেলার বিপ্লবীরা। প্রায় সবগুলি সর্বভারতীয় আন্দোলনে নদিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যোগদান করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর পরবর্তী সময় থেকে গোটা ভারতবর্ষে স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন সবচেয়ে বেশি গতি পেয়েছিল। সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গে নদিয়া জেলাও ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সাধরণত এই জেলায় ইংরেজ বিরোধী ও স্বাধীনতা আন্দোলনে দুটি সুস্পষ্ট ধারা লক্ষ্য করা গিয়েছিল যথা— জাতীয় কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের ধারা এবং সংগ্রামশীল জাতীয়াতাবাদী নেতৃত্বের ধারা। দুটি ধারায় এই জেলাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সক্রিয় ছিল।

১৮৭৬ সালে কলকাতাতে 'ভারতসভা' প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই নদিয়া জেলার জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদদের নেতৃত্বে এই সংগঠনের শাখা জেলার নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ওই বছরেই এই জেলার মেহেরপুর ও ভাজনঘাটে যথাক্রমে ভারতসভার দুটি শাখা সংগঠন গড়ে ওঠে।[৭] এর ফলে নদিয়া জেলাতে

জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চেতনাবোধের বিকাশ ঘটে। ধীরে ধীরে জন-জোয়ারের মতো সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে বহু মানুষ জাতীয়তাবাদী এবং স্বদেশী ভাবধারায় উজ্জীবিত হতে থাকে। বলাবাহুল্য একই সময়ে নদিয়া জেলাতে স্বদেশ প্রেমী নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে কৃষ্ণনগর, কুষ্টিয়া, শান্তিপুর প্রভৃতি অঞ্চলে অনুষ্ঠিত ভারতসভার প্রতিটি জনসমাবেশে অসংখ্য সাধারণ কৃষক যোগদান করেছিলেন।[৮] এই ভাবে ভারতসভা প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে নদিয়া জেলার জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদদের নেতৃত্বে সাধারণ মানুষদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও ভাবধারার বিকাশ ঘটতে থাকে। বিপ্লবী চিন্তাধার ঊষা পর্বে কৃষ্ণনগরের অন্যতম জাতীয়তাবাদী নেতা শ্রী লালমোহন ঘোষ সর্বভারতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। ভারতসভা ১৮৭৯ সালে লণ্ডনের পার্লমেন্টে তাঁর বলিষ্ঠ ও সুযোগ্য নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে ভারতীয়দের দাবি-দাওয়া আদায়ের প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলেন এবং সেই সাথে ইংল্যাণ্ডের বুদ্ধিজীবী মহলে ব্যপক জনমত গড়ে তুলতে সমর্থ হন।[৯]

ভারতের আপোষহীন স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রথম শ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। বাংলার অন্যান্য জেলার মতো নদিয়া জেলাতেও জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের প্রভাব ছিল অপরিসীম। এই জেলায় সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ বিরোধী গণ আন্দোলনে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ছিলেন তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নিতাই পাল, কালীপদ পণ্ডিত, অমল কুমার সরকার, কাশীনাথ মজুমদার, গৌর পাল, বীণাপাণি মজুমদার, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, মহাদেব পাল, হরেরাম দাস, ফজলুর রহমান, কাজী মহম্মদ মহসীন রেজা, প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।[১০] তবে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর এই জেলার মুসলিম লিগের গুরুত্বপূর্ণ এবং জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দ মুসলিম সমাজের মানুষদের মধ্যে মুসলিম লিগের ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ববৃন্দ সেভাবে মুসলিম সমাজের সমর্থন অর্জন করতে পারেননি। যাইহোক না কেন একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, এই সাংগঠনিক আদর্শের মতভেদ থাকলেও তাদের উদ্দেশ্য ছিল একটাই দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা। যার ফলস্বরূপ দেখা যায় যে বঙ্গভঙ্গ, খিলাফৎ, অসহযোগ, আইন-অমান্য এবং ভারতছাড়ো আন্দোলনে এই জেলার অগণিত স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিক মানুষ জাতীয় কংগ্রেসের ছায়াতলে যোগ দিয়ে আন্দোলন করতে দ্বিধা বোধ করেননি।

ভারতসভা দ্বারা সংগঠিত আন্দোলনে যেমন নদিয়ার সক্রিয় পদাচারণ ছিল, ঠিক তেমনি পরবর্তীকালে জাতীয় কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও নদিয়া জেলার রাজনীতিবিদদের সর্ব ভারতীয় রাজনীতির অঙ্গণে তাঁদের বলিষ্ঠ পদচারণা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গেও আমরা প্রখ্যাত ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয়দের (লালমোহন ঘোষ ও মনমোহন ঘোষ) সঙ্গে কৃষ্ণনগরের প্রথিতযশা তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য ভূমিকা লক্ষ্য করতে পারি।[১১] কংগ্রেসের জন্মদাতা হিসাবে আমদের কাছে অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম বিশেষ ভাবে পরিচিত। কিন্তু এই সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সংগঠনের উৎপত্তির ইতিহাসে অনবদ্য এক বাঙালি রাজনীতিবিদের উল্লেখযোগ্য অবদান আছে তা হয়তো আমরা অনেকেই মনে রাখি না। বস্তুত কংগ্রেসের ন্যায় একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণনগরের খ্যাতনামা উকিল শ্রী তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১২] দেখা যায় যে, ১৮৮৫ সালে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই নদিয়া জেলার প্রতিথযশা জাতীয়তাবাদী নেতা তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবাসীর মুক্তির জন্য কংগ্রেসেরই মতো একটা সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তাভাবনা করতে থাকেন।[১৩] যার প্রকাশ দেখা যায় ১৮৮৩ সালের ৪ জুলাই 'ইণ্ডিয়ান মীরর' পত্রিকায় যেখানে তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি পত্র প্রবন্ধের মধ্যে ভারতবাসীদের রাজনৈতিক ভাবে সংঘবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা ও মূল্যবোধ সম্বন্ধে তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। তাঁর এই পত্রের ফলস্বরূপ সারাদেশের বুদ্ধিজীবী মহলে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। এখানেই তিনি

থেমে যাননি নদিয়া জেলায় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও তাঁর অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় সহ বেশ কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল 'নদীয়া কংগ্রেস কর্মী সমাজ', তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ওই সংগঠনের সম্পাদক মনোনীত হয়েছিলেন।[14]

বোম্বাই শহরে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সভা (১৮৮৫ খ্রি) থেকে প্রত্যাবর্তন করে তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নদিয়া জেলাতেও ১৮৮৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের শাখা সংগঠন গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ওই বছরই কৃষ্ণনগর কলেজ লাইব্রেরির মাঠে এক জনসভার আয়োজন করেন। উক্ত সভায় তিনি নিজেই সভাপতিত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন।[১৫] ১৮৮৬ সালে নদিয়া জেলায় কংগ্রেসের প্রাদেশিক শাখা সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ, মনমোহন ঘোষ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দ একই সময়ে কংগ্রেস ও ভারতসভা উভয় সংগঠনেরই সদস্য হয়েছিলেন। ১৮৯৬ সালে কৃষ্ণনগর শহরে অনুষ্ঠিত ভারতসবার প্রাদেশিক সম্মেলনে এই সকল নেতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সংশ্লিষ্ট সভায় বিচারবিভাগের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করবার জন্য মনমোহন ঘোষ মহাশয়ের পরিকল্পনা প্রসূত ক্ষমতা বিভাজন নীতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এইভাবে সর্বভারতীয় সংগঠন ভারতসভা ও জাতীয় কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকে নদিয়া জেলার জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ সর্বভারতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।[১৬]

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের (অবিভক্ত বাংলা) জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তীব্র প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। কার্জনের এই পরিকল্পনাকে প্রতিরোধ করার জন্য তাঁরা স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন শুরু করেন। সর্বভারতীয় কংগ্রেসি নেতৃত্বের ডাকে সাড়া দিয়ে নদিয়া জেলার জতীয়তাবাদী নেতাবৃন্দ বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। শুধু সাধারণ মানুষই নয় কংগ্রেসি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত কৃষ্ণনগরের উকিল মোক্তাররাও প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্মসূচিকে সমর্থন করেছেন এবং কংগ্রেসের দ্বারা সংগঠিত আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন।[১৭] এই সকল নেতাদের মধ্যে শ্রী লালমোহন ঘোষ, তাঁর অগ্রজ ব্যারিষ্টার মনমোহন ঘোষ, খ্যাতনামা উকিল শ্রী তারাপদ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ নেতারা সারা বাংলাদেশে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯০৫ সালে নদিয়া জেলায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কর্ণধার ছিলেন কৃষ্ণনগরের তারপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। নদিয়া জেলাতে এই আন্দোলনে তিনি সার্থক নেতৃত্ব দিয়ে সুসংগঠিত ভাবে স্বদেশী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। জেলার বিভিন্ন জায়গায় মিটিং মিছিল করে নদিয়াবাসীকে জাতীয়তাবাদে উদ্‌বুদ্ধ করে তোলেন। সর্বশ্রী বেচারাম লাহিড়ী, বক্রেশ্বর ব্যানার্জী, অমূল্য কুমার গুপ্ত, জ্যোতিপ্রসাদ চ্যাটার্জী প্রমুখ স্বদেশপ্রেমী নেতা ছিলেন জাতীয় আন্দোলনে তারপদবাবুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী।[18]

নদিয়া জেলায় সংগঠিত ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দুদের সঙ্গে স্থানীয় মুসলমানেরাও অংশ নিয়েছিলেন। এদের মধ্যে স্থানীয় জমিদার সৈয়দ রওশন আলী খান, নবাব আলী চৌধুরী প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবি রাখে।[১৯] এই সকল বিত্তশালী মানুষেরা আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগান দিয়েছিলেন। শুধু বিত্তশালী মুসলিমরাই নয় জেলার সাধারণ মুসলমানরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন, ফলে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন একটি নতুন প্রাণশক্তি পেয়েছিল। সংগ্রাম চালিয়ে যেতে যে মানসিক ইন্ধন লাগে তা কবি-সাহিত্যিকেরা পূরণ করেছিলেন। তাঁদের রচনা করা স্বদেশী আন্দোলনের গান ও নাটকের মাধ্যমে নদিয়ার আপামর সাধারণ মানুষের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও স্বদেশী আদর্শ গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল। এই সকল কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত দেশাত্মবোধক বা স্বদেশী গানগুলি 'আর্যগাথা' নামক গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছিল। দেশাত্মবোধক গানের মধ্যে প্রথমেই স্মরণীয় 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা/তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা' গানটি।[২০]

গানটি দেশপ্রেমিক বাঙালিদের মধ্যে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ ভারতে যতগুলি প্রতিবাদী আন্দোলন হয়েছিল সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রবল আন্দোলনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল প্রতিক্রিয়াশীল 'রাওলাট আইনের' (১৯১৯) বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন। সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের সাথে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল রাওলাট আইন নদিয়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যেও প্রবল বিক্ষোভের ঝড় তুলেছিল। তাঁরা এই দমনপীড়ন মূলক আইনের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে মিটিং, মিছিল ও ধর্মঘট সংগঠিত করেছিলেন।[২১] সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতবর্ষের ন্যায় নদিয়া জেলাতেও ব্রিটিশ বিরোধী খিলাফত আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। খিলাফত আন্দোলনের ধারা নদিয়াবাসীদের সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে উৎসাহিত করেছিল। এই আন্দোলনের সাথে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন যুক্ত হলে অসংখ্য হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ফলে এক ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। সঙ্গত কারণেই ওই সময়ে নদিয়া জেলাতে জাতীয়তাবাদী হিন্দু-মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে শক্তিশালী অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তোলেন। তারা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করে তুলবার জন্য জেলার বিভিন্ন জায়গায় জনসভা ও মিছিল সংগঠিত করেছিলেন। এই আন্দোলনে জেলায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শ্রী হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, হেমন্তকুমার সরকার, মৌলাভী সামসুদ্দিন আহমদ ও মৌলবি আফছার উদ্দিন আহমদ, মৌলবি আজিজুল হক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।[২২] অসহযোগ আন্দোলনকে ঘিরে নদিয়ার ছাত্র সমাজের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছিল। তারা 'অসহযোগ' -এর চিন্তাধারা শহর এবং গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এর ফলে নদিয়া জেলায় অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করছিল; কার্যত বলা যায় যে এই আন্দোলন একটি গণআন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল।[২৩] সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে পরেছিল। এই জেলার স্বদেশপ্রেমীরা দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের নানা কর্মসূচি এবং স্বদেশী ভাণ্ডার গড়ে তুলেছিলেন। সেই সাথে জেলার বিভিন্ন স্থানে 'জাতীয় বিদ্যালয়' গড়ে উঠেছিল; যেমন- শান্তিপুর, নবদ্বীপ, মুড়াগাছা প্রভৃতি জায়গায়। এই বিদ্যালয় গুলি এখনো বিদ্যমান এবং শিক্ষা প্রদান করে চলেছে।

১৯২৮-২৯ সালে নদিয়া জেলাতে সম্প্রদায়গত ঐক্য ও সম্প্রীতির বাতাবরণ সৃষ্টি হলে কংগ্রেসের আন্দোলন ক্রমাগত জোরদার হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ প্রশাসনের সমস্ত প্রকার কঠোর আইন ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করে নদিয়া জেলার কংগ্রেসি যুবকরা স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারা চালিয়ে গিয়েছিল। ১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গান্ধিজী ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি 'স্বাধীনতা দিবস'[২৪] উদযাপনের আহ্বান জানালে, ভারতের অন্যান্য জায়গার মতো নদিয়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামী ছাত্রযুবকরা কৃষ্ণনগর কলেজে স্বাধীনতা দিবস পালনের জন্য আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন।[২৫] গান্ধিজীর ডাকে সাড়া দিয়ে নদিয়া জেলার কংগ্রেসকর্মীরা তাদের নিজস্ব জেলাতে আইন-অমান্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন সংগঠিত করেন। নদিয়ার ছাত্র, যুব, শিক্ষক, ডাক্তার, আইনজীবী, কৃষক-মজুর, পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সর্বশ্রেণির মানুষেরা দলে দলে কংগ্রেসে যোগদান করে সত্যাগ্রহীর তালিকায় নিজেদের নাম লেখান। মিছিল, মিটিং এর সাথে সাথে তারা গান্ধীজির মতো প্রত্যক্ষ ভাবে লবন তৈরি করে সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সূচনা করেছিল। তবে নদিয়া জেলা সমুদ্র উপকূলবর্তীতে অবস্থিত না হওয়ায় এখানকার সত্যাগ্রহীদের প্রত্যক্ষ লবণ আইন ভঙ্গ করার তেমন কোনো সুযোগ ছিল না। তবুও তারা লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য ১৯৩১

সালে স্থলপথে বাস করে মহিষাদলে যান এবং লবণ আইন ভঙ্গ করেন।[২৬] জেলার বিভিন্ন স্থানে এই আন্দোলনের আঁচ পড়েছিল। ব্রিটিশ বিরোধী আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রভাব বস্ত্রশিল্পের গড় শান্তিপুরেও পরেছিল।[২৭]

সারা দেশে যখন প্রবল ভাবে ধ্বনিত হয়েছিল 'ইংরেজ ভারত ছাড়' তখন বাংলার সাহসী বীর সন্তানেরাও এগিয়ে এসেছিলেন। আর নদিয়া জেলার বিপ্লবীরা নতুন উদ্যোমে আন্দোলনে নেমেছিলেন। নদিয়ার সর্বস্তরের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতাগণ 'আগষ্ট বিপ্লব' তথা ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে সফল করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে বেশ কয়েকটা প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং সেই মত কাজকর্ম পরিচালনা করেছিলেন। এই সকল রাজনৈতিক নেতাকর্মীগণ শহর ও গ্রামে ছড়িয়ে পরে "করবো অথবা মরবো" মন্ত্রে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। সভা, শোভাযাত্রা, হরতাল, ব্রিটিশ বিরোধী ও যুদ্ধ বিরোধী প্রচার মূলক বই বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণকে জমায়েত করা এবং দেশের সর্বত্র অচল অবস্থার সৃষ্টির জন্য ডাক-তার, রেল, সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপক আয়োজন ও প্রস্তুতি হতে লাগল। এই জন্য কলকাতা থেকে সদর শহর কৃষ্ণনগর এবং মফঃস্বলে দশ হাজার ভোল্টেজ শক্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক তার কাটার উপযোগী কাঁচি, সেতু ধ্বংসের উওপযোগী ডিনামাইট স্টিক, কংক্রিটের চাদর ছিদ্র করার জন্য বোরিং মেসিন, ব্যাটারী, নানাবিধ বিস্ফোরক সামগ্রী ও আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ এবং বিপ্লবী মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন আস্তানাতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবে জেলার বেশির ভাগ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ও বিশিষ্ট বিপ্লবীগণ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের শুরুর দিকে ব্রিটিশ পুলিশের কাছে বন্দি হয়ে পরেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণনগরের শ্রীসুকুমার গুপ্ত, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, আব্দুল মান্নান, কাজী মহম্মদ মহসীন রেজা, শান্তিপুরের ধীরানন্দ গোস্বামী, গোপাল চক্রবর্তী, নিতাই পাল, নবদ্বীপের নিরঞ্জন মোদক, শ্যামাপদ ভট্টাচার্য, শচীন্দ্রমোহন নন্দী, রাণাঘাটের বিমল চট্টোপাধ্যায়, মুড়াগাছার গোপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবীদের ব্রিটিশ সরকার বিনা বিচারে আটক করে রেখেছিল।[২৮] ফলে নেতৃত্বহীন অবস্থায় নদিয়ার নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে আন্দোলন হলেও তা খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি।

মুক্তি অন্বেষী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন আপসহীন ও আপসমুখী— এই দুই ধারায় বিভক্ত ছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের তীব্রতা ঝড়ের মতো আছড়ে পড়েছিল বাংলার ঘরে ঘরে। এই বঙ্গভঙ্গের সময়কালেই নদিয়া জেলার বিশেষ করে কৃষ্ণনগর কলেজকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণনগর শহর আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। নদিয়ার বেশিরভাগ স্বাধীনতা আন্দোলন কৃষ্ণনগরকে কেন্দ্র করেই বিস্তার লাভ করেছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানের স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীরা আপসমুখী ভাবে স্বাধীনতা আদায়ের পক্ষপাতি হলেও একমাত্র বিপ্লবী দল গুলিই প্রথম থেকে আপসহীন ভাবে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী তুলেছিল।[২৯] বাংলাদেশে (অবিভক্ত বাংলা) তথা সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের মূলোৎপাটন করার জন্য বাংলায় প্রথম গুপ্ত সমিতির উদ্ভব হয় কলিকাতার মুরারীপুকুরে। ১৯০০ সালে বিপ্লবী বারীন ঘোষ, প্রমথ মিত্র, সরলা দেবী ও ওকাকুরা (জাপানি মহিলা) প্রমুখ বিপ্লবীরা প্রথমে কলকাতার মানিকতলায় এবং পরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলেন। তাঁদের গুপ্ত সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।[৩০]

স্বদেশী যুগে বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবী নায়ক শহিদ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নদিয়া জেলাতে বিপ্লবের বীজ রোপন করেছিলেন, তা বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে এক বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়েছিল। এই জন্য তিনি নদিয়া জেলায় গুপ্ত সমিতির জনক রূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন। ফলে নদিয়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল। তবে এই সময়ের গুপ্তসমিতি গুলি বাহ্যিক দিক দিয়ে ব্যায়ামাগার এবং জনসেবা মূলক কাজে লিপ্ত ছিল।[৩১] এই গুপ্ত সমিতি গুলি বিভিন্ন ব্যায়ামের আখড়া এবং সেবামূলক সংঘের নামে পরিচিত

ছিল। কেননা এই সমিতি গুলি নানা জনসেবামূলক কাজ এবং শরীরচর্চা করতো। সংগঠন গুলি জনসেবা মূলক গৌণ উদ্দেশ্যের আড়ালে প্রধানত বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত আচরণ বিধি পালন করতেন। তবে ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী এই সকল সংগঠন গুলির প্রতি বিশেষ নজর রাখতেন। খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে নদিয়া জেলাতে যে সমস্ত নতুন নতুন গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠতে থাকে, পরবর্তীকালে সেগুলিকে ঘিরে নদিয়া জেলাতে গুপ্তসমিতির বিরাট কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল- বিশেষত বাঘাযতীনের উত্তরকালে। স্বভাবতই এই সময়কালের গুপ্ত সমিতি গুলির কার্যধারা বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন কালে উদ্ভূত গুপ্ত সমিতি গুলির প্রাণপুরুষ বলতে যাকে বোঝানো হত তিনি হলেন বিপ্লবী অনন্তহরি মিত্র।[৩২] ফলে দেখা যায় যে, ধীরে ধীরে নদিয়া জেলার সর্বত্রই গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠতে থাকে এবং এই জেলার কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কুষ্ঠিয়া, রানাঘাট, কুমারখালি প্রভৃতি অঞ্চল সমিতির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।[৩৩] নদিয়া জেলায় উপরোক্ত সমিতিগুলি ছাড়াও বিভিন্ন আখড়া, সেবাশ্রম, সভাসমিতি ও সাংস্কৃতিক নানান সংঘের আড়ালেও চলত গুপ্ত সমিতির কাজ। বলাবাহুল্য, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লব সংগঠিত করার জন্যই এইসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছিল বলে প্রায়ই এরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কাজ ও অসন্তোষ সৃষ্টিতে লিপ্ত থাকত। স্বভাবতই ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছে তাই তারা মারাত্মক রকম বিরক্তি ও ভীতির কারণ হয়ে দাড়িয়েছিল। বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস এর নাম না করলেই নয় যিনি লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা নিয়ে হামলা করেছিলেন।[৩৪] তবে তার বিপ্লবী কাজ কর্ম প্রায় নদিয়ার বাইরে ছিল। স্বভাবতই বলা যায় যে, এই সময়কালের গুপ্ত সমিতিগুলির কার্যধারা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে।

বিংশশতকের শুরু থেকেই বিপ্লববাদ মাথাচারা দিতে থাকলে তাদের দমনের জন্য ব্রিটিশ বাহাদুরের কড়া পাহারা থাকতো ফলে বিপ্লবীরা নিজেদের বাচাতে অনেক সময় মাঝি সেজেও নৌকা চালাতো।[৩৫] ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী "জেলে ত্রিশ বছর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, বিপ্লবীরা পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন নদী পথে চলাফেরা করতো। পুলিশ বাহিনী বড়ো ঘাসী নৌকার উপর বেশি নজর দিত। এই কারণে তারা অত্যন্ত সতর্ক হয়ে থাকতেন। কোনো রকম বাধা-নিষেধ বিপ্লবীদের আত্মবিশ্বাস এবং উদ্যমকে দমন করতে পারেনি, বরং তাঁরা নানা ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে নতুন উদ্যোগে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। ১৯২০ সালের ১লা আগস্ট দিনটিতে খিলাফত দিবস উদযাপনের জন্য ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির নির্দেশে বঙ্গীয় খিলাফত কমিটি সারা বাংলায় হরতাল পালনের নির্দেশ জারি করে। এই নির্দেশ অনুসারে নদিয়া জেলার খিলাফত আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ রওসন আলি চৌধুরী, মৌলবি সৈয়দ আব্দুল কুদ্দুস, মৌলবি সামসুদ্দিন আহমদ, ভিকু মোল্লা, ছাবের আলি সর্দার, হাজারী লস্কর প্রমুখের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট জেলায় তৃতীয় খিলাফত দিবসের হরতাল পালিত হতে থাকে। ফল স্বরূপ দেখা যায় যে, নদিয়া জেলাতে খিলাফত আন্দোলনের ধারা নদিয়াবাসীদের ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে উৎসাহিত করে। কৃষ্ণনগর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকার অধিবাসীদের জাতীয়তাবাদে উদবুদ্ধ করে তুলবার জন্য ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণনগরের ছাত্রদের উদ্যোগে খিলাফত মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই জেলার মহান বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব শুধুমাত্র ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ করেনি বৃহত্তর ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব দিয়েছেন। মৌলবি সামসউদ্দিন আহমদ কেবল নদিয়া জেলাতেই নয় তিনি সারা বাংলায় খিলাফত আন্দোলনকে সাফল্যজনক ভাবে সুসংগঠিত করার দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[৩৬]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই সময় আইন-অমান্য আন্দোলনের পটভূমিকায় নদিয়া জেলার জাতীয়তাবাদী মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। নদিয়ার পুরুষ কংগ্রেস নেতাদের সাথে আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করে আইন-অমান্য আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী ও বেগবান করে তুলেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা সারা বাংলা মহিলা ফেডারেশনের শাখা স্বরূপ নদিয়ার কংগ্রেসী মহিলা

নেতৃবৃন্দের অন্যতম নির্মলনলিনী ঘোষ, প্রতিভা দেবী, নির্ঝরণী সরকার, সুধীরা সরকার ও সাবিত্রীদেবী প্রমূখ নদিয়া জেলা কংগ্রেসের মধ্যে 'নদিয়া মহিলা সংগঠন' গড়ে তুলেছিলেন। এঁদের নেতৃত্বে নদিয়া জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে বহু মহিলা সক্রিয় ভাবে আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন।[৩৭] নদীয়ার বাইরেও এই জেলার বীরাঙ্গনাগণ সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে বিপ্লবী বীণা দাস অন্যতম ছিলেন। তিনি সহিংস আন্দোলনের সমর্থক রূপে ১৯৩২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তৎকালীন বাংলার গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন।[৩৮]

দুর্ভিক্ষের পরাকাষ্ঠা থেকে সমাজকে উদ্ধারে তৎপর অন্ন উৎপাদনকারী যোদ্ধা কৃষক সমাজও স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনো ভাবেই পিছিয়ে ছিলেন না। মহাবিদ্রোহের নায়ক মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে বহরমপুরে ১৯নং রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করার পর মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষকরা সর্বতোভাবে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৩৯] যার ব্যাপক প্রভাব নদীয়া জেলাতেও পরেছিল। ম্যালির বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস ও স্যার এফ. জি. হ্যালিডের বিদ্রোহকালীন মিনিটস থেকে বঙ্গদেশের নদিয়া, বর্ধমান, চব্বিশ পরগণা, বাঁকুড়া, বীরভূম, ছোটোনাগপুর অঞ্চলের কৃষকদের এই বিদ্রোহে ব্যাপক হারে অংশগ্রহণের কথা জানা যায়।[৪০] নীল চাষ করানোর জন্য নীলকর সাহেবরা যে অত্যাচার চালিয়েছিল তার বিরুদ্ধেও কৃষক সমাজ সরব হয়েছিলেন এবং নানা স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। একবার নীল বুনতে রাজি না হওয়ায় আর্ণট সাহেব দুই চাষীকে পিটিয়ে মেরে ফেলেন। বিক্ষুব্ধ কৃষকরা আর্ণটকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুন করে প্রতিশোধ নেয়।[৪১] নদীয়ায় নীলকরদের বিরূদ্ধে যে বিদ্রোহ হয়েছিল তা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছিল সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দেখা যায় যে, ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাস থেকে নদীয়া, যশোহর, বারাসাত, পাবনা, রাজশাহী প্রভৃতি জেলায় কৃষকরা নীলকুঠিগুলি আক্রমণ করতে থাকে। এই সময় সমস্ত কৃষ্ণনগর (নদীয়া) জেলাই নীলকরদের আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল।[৪২] পরিস্থিতি এমনই হয়েছিল যে, এই জেলার নীল চাষীরা কোনো রকম প্রশাসনিক প্রতিশ্রুতি মূলক কথা মানতে নারাজ ছিলেন। আন্দোলনের প্রকৃতি এত তীব্র ছিল যে 'নীল কমিশন' কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতা ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল।[৪৩] বল্লভপুরের নীলচাষীদের বিদ্রোহের কথা পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার কর্তৃক প্রকাশিত পঞ্চম শ্রেণীর 'কিশলয়' বইতে 'নীল বিদ্রোহের কাহিনী' গল্পে পড়েছি। এই বল্লভপুর নদীয়াতেই অবস্থিত। এছাড়াও বাদকুল্লার কাছেই ধর্মদহ, মণ্ডবঘাট এলাকায় ব্যাপক ভাবে আন্দোলন হয়েছিল।[৪৪]

ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন থেকে প্রায় ২০০ বছর পর ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট শুক্রবার ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সারা ভারতের সঙ্গে সমগ্র নদীয়াবাসী সেদিন স্বাধীনতার আস্বাদ লাভ করতে পারেনি। নদিয়ার মাটিতে স্বাধীন ভারতের প্রথম তিরঙ্গা পতাকা ওঠে ১৮ অগস্ট। কারণ তৎকালীন ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটনের দেশ বিভাগের পরিকল্পনা অনুসারে সম্পূর্ণ নদীয়া জেলা পাকিস্থান রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এর ফলে দেশের রাজনৈতিক মহলে প্রচণ্ড বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিতর্কিত বিষয়কে দ্রুত সমাধানের জন্য স্যার সিরি র‍্যাডক্লিফের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। স্যার সিরিল রাডক্লিফের বাউন্ডারি কমিশনের সুপারিশ অনুসারে অবিভক্ত নদীয়া জেলার ৩টি মহকুমা (কুষ্ঠিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙা) পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং নদীয়া বাকি দুটি মহকুমা (কৃষ্ণনগর ও রানাঘাট) নিয়ে প্রথম 'নবদ্বীপ' জেলা নামে ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হয়।[45] ১৫ অগস্ট থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত ৩ দিন এই রায় কার্যকরী করতে সময় লেগেছিল। অর্থাৎ ১৮ই আগষ্ট সোমবার 'নবদ্বীপ' তথা 'নদীয়া' ভরতবর্ষের মানচিত্রে স্থান পাবার পর জনগণ ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে নদীয়ায় স্বাধীনতা উৎসব পালন করেছিলেন। ১৫ই থেকে ১৭ই আগষ্ট এই তিন দিন নদীয়াবাসীরা বিশেষ করে হিন্দুরা ভীষণ আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটান।[46] ভারতবর্ষ

স্বাধীন হলেও নদীয়াবাসী তখনো তাদের স্বাধীনতার জন্য লাড়াই জারি রেখেছিলেন। তবে দেরি হলেও শেষ পর্যন্ত নদিয়াবাসী পেয়েছিল ভারতবাসী হিসাবে স্বাধীনতার স্বাদ।

---

[১] Garrett, J. H. E. (1910), *Bengal District Gazetteers Nadia,* Calcutta: The Bengal Secretariat Press, p- 28
[২] বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত (সম্পাদিত) (১৩৪৯ বঙ্গাব্দ), *ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী (প্রথম ভাগ),* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ- ২২
[৩] চট্টোপাধ্যায়, বাসুদেব (২০০৩), *বাংলায় বিপ্লববাদের পালাবদল,* কলকাতা: প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পৃ- ৮৫
[৪] চট্টোপাধ্যায়, রূপশ্রী (২০১৮), *জন বিদ্রোহের ইতিহাস উনিশ ও বিশ শতক,* কলকাতা: মিত্রম, পৃ- ৩৭
[৫] রহমান, মমিনূর (২০১৭), *নদিয়া জেলায় ভারতের মুক্তি আন্দোলন ১৯০৫-১৯৩১,* কলকাতা: পৃ-১২৩
[৬] Banerjee, Surendranath (1925), *A Nation in Making,* London: Humphrey Milford, p. 41-42
[৭] Bagal, Jogesh Chandra (1983), *History of the Indian Association,* Calcutta: Indian Association, p. 21
[৮] Jogesh Chandra Bagal, Loc. cit., pp. 70- 76
[৯] Ibid., p. 42
[১০] নদীয়া জেলা নাগরিক পরিষদ, (১৯৭৩), *স্বাধীনতা সংগ্রামে নদীয়া,* কৃষ্ণনগর, পৃ. ২০৯-৩৮১
[১১] তদেব, পৃ- ১২৩-১২৪
[১২] Bose, Nemai Sadhan (1960), *The Indian Awakening and Bengal*, Calcutta: Firma K. L. Mukhopadhyaya, p. 182
[১৩] Nemai Sadhan Bose, Op. cit., p. 182
[১৪] রায়, মোহিত (১৩৯৫ বঙ্গাব্দ), *নদীয়া উনিশ শতক*, কলকাতা: অমর ভারতী, পৃ. ২৬-২৯
[১৫] তদেব, পৃ- ২৯-৩১
[১৬] রহমান, মমিনূর, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৩০
[১৭] Amrita Bazar, 1907, 22nd March, p. 7
[১৮] Amrita Bazar, 1906, 14th March, p. 3
[১৯] The Bengali, 1908, 9th June, p. 7
[২০] সাধুখাঁ, সুদীপ্ত (২০২৪), *হাজার বছরের বাংলা সংগীতের ইতিহাস*, কলকাতা: সেতু প্রকাশনী, পৃ-৫৫
[২১] Amritabazar, 1919, 13th April, page no. 6
[২২] রহমান, মমিনূর, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৩৯
[২৩] মাহমুদ, আব্দুল ওয়াহাব, সম্পাদিত। *ইতিহাস অনুসন্ধান,* সংখ্যা ১০, (১৯৯৫) পার্থসারথি রুজ, *অসহযোগ আন্দোলন ও নদীয়া*, কলকাতা: ফার্মা কে এল এম, পৃষ্টা- ৭৭৪-৭৮৫
[২৪] মোদক, দেবনারায়ণ (২০২০), *নাকাশিপাড়ার কথা: বিবিধ প্রসঙ্গ*, বেথুয়াডহরি: কথাকৃতি, পৃ-১০০
[২৫] আচার্য, দেবদাস (সম্পাদিত) (১৯৭৭), *কৃষ্ণনগর কলেজ পুনর্মিলন উৎসব স্মারক গ্রন্থ*, কৃষ্ণনগর: বঙ্গরত্ন মেসিন প্রেস, পৃ-২১-২২
[২৬] রহমান, মমিনূর, *প্রাগুক্ত*, পৃ- ৩০১
[২৭] ভট্টাচার্য, কালীকৃষ্ণ (২০২১), *শান্তিপুর পরিচয়*, শান্তিপুর: শান্তিপুর মরমি, পৃ- ৩৩১
[২৮] *স্বাধীনতা সংগ্রামে নদীয়া, প্রাগুক্ত*, পৃ- ১৮৮-১৯৪
[২৯] চট্টোপাধ্যায়, বাসুদেব, *প্রাগুক্ত*, পৃ- ২৬
[৩০] দেবনাথ, অমিত (২০২৩), *ব্রিটিশরাজ বনাম বাঘাজ্যোতিন,* কলকাতা: পত্রলেখা, পৃ-১৬-১৭
[৩১] চট্টোপাধ্যায়, বাসুদেব, *প্রাগুক্ত*, পৃ- ১৯
[৩২] গুপ্ত, শিবরাম (১৩৬১ বঙ্গাব্দ), *শহিদ অনন্তহরি মিত্র,* কৃষ্ণনগর: হোমশিখা প্রকাশনী বিভাগ, পৃ-১৭
[৩৩] রহমান, মমিনূর, *প্রাগুক্ত*, পৃ- ১৬২
[৩৪] গুপ্ত, নীহাররঞ্জন (১৩৬০ বঙ্গাব্দ), *বিদ্রোহী ভারত*, (দ্বিতীয় পর্ব), কলকাতা: সবুজ সাহিত্য আয়তন, পৃ- ১১৭
[৩৫] গুহ, নলিনীকিশোর (২০১২), *বাংলায় বিপ্লববাদ*, কলকাতা: মিত্রম, পৃ- ১১৪
[৩৬] রহমান, মমিনূর, *প্রাগুক্ত*, পৃ- ২৩৭-২৩৮

[৩৭] তদেব, পৃ-৩০৬
[৩৮] দাশগুপ্ত, কমলা (১৯৫৪), *রক্তের অক্ষরে*, কলকাতা: নাভানা, পৃ- ৬০-৬১
[৩৯] *স্বাধীনতা সংগ্রামে নদীয়া, প্রাগুক্ত*, পৃ- ৬৯
[৪০] রূপশ্রী, চট্টোপাধ্যায় (২০১৮), *জন বিদ্রোহের ইতিহাস উনিশ ও বিশ শতক*, কলকাতা: মিত্রম পৃ- ২৫
[৪১] দত্ত, সঞ্জিত (১৯৯৬), *অঞ্জনা নদী তীরে*, দোগাছি, কৃষ্ণনগর: দোগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত, পৃ- ২৭
[৪২] Hindoo Patriot, 17th March, 1860
[৪৩] Friend of India, 19th July, 1860
[৪৪] বিশ্বাস, সুজিত কুমার (২০০২), *বাদকুল্লা পরিচয়*, বাদকুল্লা: বাদকুল্লা সাহিত্য সংসদ, পৃ- ৪০
[৪৫] Majumdar, Durgadas (1978), *West Bengal District Gazetteer- Nadia*, Kolkata: Government of West Bengal, p-2
[৪৬] ঘোষ, নিতাই (২০০৮), *ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নদীয়া*, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, পৃ-৩৫